ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৩. বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৩. ১০. ২. ২. আনুগত্যসহ নসীহত ও দাওয়াত

কুরআন-সুন্নাহর উপর্যুক্ত নির্দেশাবলির আলোকে সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী মূলধারার আলিমগণ মূলত সরকার পরিবর্তনের চেয়ে সরকার সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। সরকারের বা প্রশাসনের অন্যায়, অনাচার, কুরআন-সুন্নাহের বিরোধিতা বা ইসলাম বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস ও আইন-কানুনের প্রতিবাদে তাঁরা রাষ্ট্রের আনুগত্য বজায় রেখে সরকারকে নসীহত, ওয়ায ও দাওয়াত দিতেন এবং জনগণকেও সচেতন করতেন। তবে বিদ্রোহ, হটকারিতা, বলপ্রয়োগ ও রক্তপাত কঠোরভাবে নিষেধ করতেন।
আমরা আগেই বলেছি যে, উমাইয়া যুগ থেকেই বিচ্যুতি শুরু হয়। আর কখনো কখনো এ বিচ্যুতি ছিল ভয়াবহ। ইয়াযিদের যুগ বা ৬০ হিজরী থেকে পরবর্তী প্রায় ৫০ বৎসর বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাঁরা এ সকল বিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করেছেন। সাধ্য ও সুযোগমত প্রতিবাদ করেছেন, নসীহত করেছেন, কিন্তু আবেগতাড়িত হন নি। সাহাবীগণের কয়েকটি সুপরিচিত ঘটনা উল্লেখ করে আমরা পরবর্তী যুগসমূহের কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করব।
তারিক ইবনু শিহাব বলেন:

أوَّلُ من بدأَ بالخُطبةِ يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ ، مروانُ . فقامَ إليهِ رجلٌ ، فقالَ: الصَّلاةُ قبلَ الخُطبةِ ، فقالَ: قد تركَ ما هُنالِكَ ، فقالَ أبو سعيدٍ: أمَّا هذا فقد قضَى ما عليهِ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: مَن رأى مِنكُم مُنكرًا فليغيِّرهُ بيدِهِ ، فإن لَم يَستَطِع فبِلسانِهِ ، فإن لم يستَطِعْ فبقَلبِهِ . وذلِكَ أضعَفُ الإيمانِ

“প্রথম যে ব্যক্তি সালাতুল ঈদের খুতবা সালাতের আগে নিয়ে আসে সে মারওয়ান ইবনুল হাকাম। তখন এক ব্যক্তি তার দিকে দাঁড়িয়ে বলে, খুতবার আগে সালাত। মারওয়ান বলেন: তৎকালীন নিয়ম পরিত্যক্ত হয়েছে। তখন আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, এ ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)কে বলতে শুনেছি: ‘তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় দেখতে পায় তবে সে যেন তা তার বাহুবল দিয়ে পরিবর্তন করে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে সে যেন তার বক্তব্য দিয়ে তা পবিবর্তন করে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন তার অন্তর দিয়ে তা পরিবর্তন (কামনা) করে, আর এ হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।’’[1]

উমাইয়া প্রশাসক ওয়ালীদ ইবনু উকবা মদপান করতেন। তিনি একদিন মাতাল অবস্থায় ফজরের সালাতে ইমামতি করেন। তার পিছনে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) জামাতে শরীক ছিলেন। ওয়ালীদ মাতাল অবস্থায় থাকার কারণে ফজরের সালাত চার রাকআত আদায় করেন এবং সালাম ফিরিয়ে বলেন: কম হলো কি? আরও লাগবে? তখন মুসল্লিগণ বলেন আজ সকালে তো আপনি বেশি বেশিই দিচ্ছেন (আপনি ইতোমধ্যেই দু রাকআত বেশি দিয়েছেন! আর লাগবে না!!)।’’[2]

উমাইয়া যুগের এক বিদ্রোহী রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন মুখতার সাকাফী (১-৬৭ হি)। ৬৪ হিজরীতে ইয়াযিদের মৃত্যুর পরে

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের পক্ষ থেকে তিনি কুফার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কুফায় প্রবেশের পর তিনি নিজেকে আলী (রা)-এর পুত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যার খলীফা বলে দাবি করেন এবং ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হন। হুসাইনের হত্যায় জড়িত সকলকেই তিনি হত্যা করেন। এভাবে তিনি কূফা ও পার্শবতী এলাকার শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি দাবি করেন যে, জিবরাঈল (আঃ) তার কাছে ওহী নিয়ে আগমন করেন। তিনি ধর্মদ্রোহিতা, বিভ্রান্তি ও কুফরী মতামতের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন। ৬৭ হিজরীতে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের বাহিনী তাকে পরাজিত ও হত্যা করে। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) এ ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের সাধারণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।[3]

ইমাম বুখারী তাঁর আত-তারীখুল কাবীর গ্রন্থে তাবিয়ী আব্দুল কারীম বাক্কা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, ‘‘আমি দশজন সাহাবীর সঙ্গ পেয়েছি যারা পাপী-জালিম শাসক-প্রশাসকদের পিছনে সালাত আদায় করতেন।’’[4]
সাহাবীগণের পরবর্তী যুগগুলির মধ্যে সরকারের ইসলাম বিরোধিতার সবচেয়ে খারাপ অবস্থাগুলির অন্যতম (১) আববাসী খলীফা মামুন, মু’তাসিম ও ওয়াসিকের সময়ে কুরআনের কিছু বিষয় অস্বীকার করার ও কুরআনকে মাখলূক বলার ‘কুফরী মতবাদ’ প্রতিষ্ঠা এবং (২) মোগল বাদশাহ আকবারের সময়ে ‘‘দীন-ই- ইলাহী’’ প্রতিষ্ঠা। এ দুটি ঘটনার মুকাবিলায় ও ঈমান-আকীদা সংরক্ষণে আলিমগণের পদক্ষেপ আমরা আলোচনা করব।

ক. আববাসী শাসকদের কুফরী মতবাদের প্রতিবাদে ইমাম আহমদ
তৃতীয় হিজরী শতকের শুরুতে আববাসী খলীফা মামুন (রাজত্ব ১৯৮-২১৮ হি) মুতাযিলী ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেন এবং একে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। গ্রীক দর্শনের ভিত্তিকে কুরআনের নির্দেশনা ব্যাখ্যা করে এ মতবাদ তৈরি করা হয়। এ মতবাদে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন বিশ্বাস কয়েছে। এ সকল বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে ‘‘কুরআন আল্লাহর সৃষ্ট বা মাখলূক’’। এছাড়া এ মতবাদে জান্নাতে আল্লাহর দর্শন অস্বীকার করা হয়, যদিও কুরআনে সুস্পষ্টত বলা হয়েছে যে, জান্নাতে মুমিনগণ আল্লাহর দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করবেন।
খলীফা মামুন রাষ্ট্রের সকলকে এ বিশ্বাস গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। ইমাম আহমদ ও আহলুস সুন্নতের আলিমগণ ঘোষণা দেন যে, কুরআন আল্লাহর কালাম এবং তাঁরই সিফাতের অংশ। আল্লাহর কোনো সিফাত বা বিশেষণ সৃষ্ট হতে পারে না। কাজেই কুরআনকে মাখলূক বা সৃষ্টবস্তু বলে বিশ্বাস করা কুফরী। অনরূপভাবে জান্নাতে আল্লাহর দর্শন অস্বীকার করলে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত অস্বীকার করা হয়, এজন্য এরূপ বিশ্বাস কুফরী।
এ মত প্রতিষ্ঠায় মামুন ছিলেন অনমনীয়। এ মত গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী আলিমদেরকে গ্রেফতার করে তিনি অবর্ণনীয় অত্যাচার করতে থাকেন। অত্যাচারের মুখে যারা মুতাযিলী মতবাদ মেনে নিত তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হতো। অন্যদেরকে আটক রেখে অত্যাচার চালানো হতো এবং কাউকে কাউকে নির্মমভাবে হত্যা করা হতো। মামুনের পরে পরবর্তী খলীফা মু’তাসিম বিল্লাহ (২১৮-২২৭ হি) ও ওয়াসিক বিল্লাহ (২২৮-২৩২ হি) এভাবে এমত প্রতিষ্ঠর জন্য এরূপ অত্যাচার অব্যাহত রাখেন। পরবর্তী শাসক মুতাওয়াক্কিল (২৩২-২৪৭ হি) এ অত্যাচারের অবসান ঘটান।

সুদীর্ঘ প্রায় ৩০ বৎসরের এ কুফরী মতাদর্শের শাসন ও অত্যাচারের সময়ে মূলধারার আলিমগণের অন্যতম নেতা ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি)। তিনি মু’তাযিলী মতবাদের কুফরী ও বিভ্রান্তি প্রকাশ করেন, শত

অত্যাচারেও এ মতবাদের স্বীকৃতি প্রদান থেকে বিরত থাকেন এবং দীর্ঘ সময় কারাগারের অন্তরালে অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রেখেছেন, জুমুআর খুতবায় খলীফা ও প্রশাসনের জন্য দুআ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি কখনোই বিদ্রোহ, আইন অমান্য বা সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অনুমতি দেন নি। সরকারের জুলুম ও সরকার পক্ষের আলিমগণের প্রচারণায় সাধারণ মানুষ ও সাধারণ আলিমগণ এ কুফরী মত গ্রহণ করতে থাকেন। পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাত বা মূলধারার আলিমগণ ও তাদের অনুসারী সাধারণ মুসলিমগণ অত্যাচারিত হওয়া ছাড়াও সাধারণের মধ্যে এরূপ কুফরী মতবাদের দ্রুত প্রসারে বিচলিত হয়ে পড়েন। অনেকেই সরকারের নির্দেশ অমান্য করে সমাজে হক্ক কথা দ্রুত প্রচারের বা সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে অস্ত্র ধারণের চিন্তা করেন। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল তাদেরকে বিশেষভাবে নিষেধ করেন। তিনি বারবারই বলতেন:

هذه فتنة خاصة وإذا وقع السيف وسالت الدماء صارت فتنة عامة إياكم والدماء إياكم والدماء إياكم والدماء

‘‘এখন তো ফিতনা ও অত্যাচারের শিকার অল্প কিছু মানুষ। আর যদি অস্ত্রধারণ করা হয় এবং রক্তপাত করা হয় তবে তা সাধারণ ফিতনা-ফাসাদে পরিণত হবে এবং সাধারণ জনগণ কষ্ট ও অত্যাচারের শিকার হবে। খবরদার! তোমরা রক্তপাত থেকে দূরে থাক! খবরদার! তোমরা রক্তপাত থেকে দূরে থাক! খবরদার! তোমরা রক্তপাত থেকে দূরে থাক!!!’’[5]

এখানে লক্ষণীয় যে, ইমাম আহমদ ও অন্যান্য আলিম মামুনের এ মতবাদকে কুফর বলে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু কখনোই মামুনকে বা যারা এ মত গ্রহণ করছিল তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে কাফির বলে গণ্য করেননি, বরং তাদের আনুগত্য ও তাদের পিছনে সালাত আদায় অব্যাহত রেখেছেন। মুতাযিলী মতের বিভিন্ন আকীদা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক। এ বিশ্বাস পোষণের মাধ্যমে এ সকল আয়াতকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু মুতাযিলীগণ এ সকল আয়াতকে সরাসরি অস্বীকার করত না; বরং বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে তার অর্থ পরিবর্তন করে তারা তাদের এমতকে ‘‘কুরআন-সম্মত’’ বলে দাবি করত। তারা বলত না যে, আমরা কুরআন বা হাদীস অস্বীকার করি। বরং তারা বলত যে, কুরআনের এ কথাটি অমুক বা তমুক অর্থে আমরা গ্রহণ করি। আর আমরা আগেই দেখেছি যে, এক্ষেত্রে ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা হয় না। বরং তাকে ‘সন্দেহের সুযোগ’ (Benefit of doubt) প্রদান করা হয় এবং মনে করা হয় যে, সে হয়ত সত্যিই না বুঝে এরূপ কুফরী মত গ্রহণ করেছে। এর অর্থ এ নয় যে, তার মত বা ব্যাখ্যা সঠিক বলে মেনে নেওয়া হলো। বরং তাকে বিভ্রান্তিতে নিপতিত মুসলিম বলে গণ্য করা হলো। আর এজন্যই ইমাম আহমদ ও অন্যান্য আলিম অনমনীয় দৃঢ়তার সাথে সঠিক মতটি বর্ণনা করেছেন এবং কোনো অত্যাচারেই রাষ্ট্রীয় মতবাদকে কুরআন-সুন্নাহ সম্মত বলে স্বীকৃতি দেন নি।

ইমাম আহমদ ও তাঁর সাথীরা এরূপ অনমনীয়তার পাশাপাশি ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং দ্রুত অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করেননি। বরং অত্যাচার ও কষ্ট নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সাধারণ জনগণকে রক্তারক্তি ও হানাহানি থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থেকেছেন। এ সময়ে যারা কুফরী মতের প্রসার রোধে আইন ভঙ্গ করেছিলেন বা দ্রুত ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন তারা কেউ সফল হন নি। বরং তাদের কারণে অনেকেই কষ্টে নিপতিত হয়েছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ও তাঁর সাথীদের ধৈর্যসহ সত্যকথন এক সময় ফল প্রসব করে। দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বৎসর পর খলীফা মুতাওয়াক্কিল (২৩২-২৪৭ হি) মূলধারার আলিমদের মত গ্রহণ করেন।

মুতাযিলী ও অন্যান্যদেরও তাদের মতবাদ চর্চার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এ বিষয়ক সকল রাষ্ট্রীয় জবরদস্তি থামিয়ে

দেওয়া হয়। বস্তুত ইসলামের ইতিহাসে রাষ্ট্র কখনো ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে নি। সকল ধর্মের অনুসারীরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সাথে তাদের ধর্মপালন করেছেন এবং নাগরিক অধিকার ভোগ করেছেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন মুসলিম ফিরকা তাদের মতামত অনুসরণ করেছেন। তারা পারস্পরিক দলাদলি করলেও রাষ্ট্রপ্রশাসন সাধারণত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে নি। ইউরোপের খৃস্টান দেশগুলির মত ধর্মদ্রোহিতা (heresy) নির্মূলের নামে ভিন্নধর্ম বা ভিন্নমতের অনুসারীদের নির্মুল করা হয় নি। মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিকের গ্রীক দর্শন ভিত্তিক এ মুতাযিলী শাসনামল ছিল ব্যতিক্রম।

খ. আকবারের দীনে ইলাহীর প্রতিরোধে ইমাম সিরহিন্দী

মোগল সম্রাট আকবরের (রাজত্ব ১৫৫৬-১৬০৫ খৃ) দীনে ইলাহীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কুফরী প্রতিষ্ঠার মত এমন ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। সম্রাট আকবরের সময়ে সামগ্রিকভাবে ভারতের মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় অবক্ষয় বিরাজ করছিল। আকবরের ‘‘দীন-ই-ইলাহী’’-র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে অবক্ষয় চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে।

খৃস্টীয় ১২শ-১৩শ শতাব্দী বা হিজরী পঞ্চম-সপ্তম শতাব্দীতে দুশতাব্দীরও অধিককালব্যাপী পশ্চিম থেকে ইউরোপীয় খৃস্টানগণের একের পর এক বর্বর ক্রুসেড আক্রমনে ছিন্নভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের দুর্বল অবস্থার মধ্যেই খৃস্টীয় ১৩শ শতকে বা হিজরী ৭ম শতকে মুসলিম দেশগুলির উপর পূর্ব থেকে তাতার ও মোঙ্গলদের বর্বর হামলা শুরু হয়। একপর্যায়ে ১২৫৮ খৃ/৬৫৬ হিজরী সালে বাগদাদের পতন ঘটে। এভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

এ সময়ে কেন্দ্রীয় শাসন, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। মূলত সুফীয়ায়ে কেরাম, সূফী দরবার ও খানকার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে দীনী শিক্ষার ধারা টিমটিম করে অব্যাহত থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে তাসাউফ ও তরীকতের নামে অগণিত ভন্ড দরবার, খানকা ও তরীকার সৃষ্টি হয়। তরীকতের নামে মুসলমানদেরকে ইসলামী শরীয়ত ও ইসলামী আকীদা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে বিভিন্ন পাপ, কুফর ও শিরকী বিশ্বাসে নিমজ্জিত করা হয়। এ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশসহ সমগ্র ইসলামী জগতের অবস্থা।

এ সময়ে ইরানে ও ভারতে অনেকে প্রচার করতে থাকে যে, এক হাজার বৎসরের মাথায় ইসলাম ধর্ম ও মুহাম্মাদী নুবুওয়াতের যুগ শেষ হয়ে যাবে এবং নতুন মিলেনিয়ামে বা সহস্রাব্দে নতুন দীনের আবির্ভাব ঘটবে। এ মতবাদের ভিত্তিতে সে সময়ে নতুন নতুন নুবুওয়াতের দাবিদারের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। ৯১০ হিজরীতে জৌনপুরের সায়্যিদ মুহাম্মাদ নিজেকে প্রতিশ্রুত মাহদী বলে দাবি করে এবং দ্রুত সারা ভারতে তার মত ছড়িয়ে পড়ে। ৯৭৭ হিজরীতে মুল্লা মুহাম্মাদ ও তার যিক্রী দলের আবির্ভাব হয় এবং দ্রুত তারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করে। ভারতের সর্বত্র অনেক মুসলিম তার দীন গ্রহণ করে।

এসময়ের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মত ছিল ইরানের নুকতাবী মতবাদ। এ মতবাদের মূল কথা ছিল (ক) হাশর-নশর বলে কিছু নেই; (২) কুফরী-নাস্তিকতা বৈধ বিষয়; (গ) সব কিছ বৈধ; (ঘ) জান্নাত-জাহান্নাম এ দুনিয়ারই উন্নতি অবনতি; (ঙ) বিবর্তনবাদ; (চ) আরবী নুবুওয়াতের যুগ শেষ এখন আজমী নুবুওয়াতের যুগ শুরু হচ্ছে।

সম্রাট আকবর নিজে ধার্মিক মুসলিম ছিলেন। তিনি শাইখ মুবারক নাগুরী নামক একজন কথিত সুফীর ভক্ত ছিলেন। ইসলামী বিশ্বকোষে শাইখ মুবারক নাগুরীকে আকবারের দরবারে সুফীবাদের প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করা

হয়েছে।[6] শাইখ মুবারক নামক এ ‘‘সূফী’’ ছিলেন উপর্যুক্ত নুকতাবী মতবাদের অনুসারী। শাইখ মুবারাকের দু পুত্র, আকবরের নবরত্নসভার অন্যতম সদস্য আবুল ফযল ও ফৈযীও এ মতের অনুসারী ছিলেন।
এ সকল মানুষ নতুন একটি বিশ্বজনীন অনারব ধর্ম প্রবর্তন করতে এবং এ মহান ধর্মের প্রবর্তকের মর্যাদায় আসীন হতে আকবরকে প্ররোচিত করতে সক্ষম হন। তাদের প্ররোচনায় রাজত্ব গ্রহণের (১৫৫৬খৃ/৯৬৩হি) প্রায় ৩০ বৎসর পরে ১৫৮২খৃ/৯৯০ হিজরীতে আকবর দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করেন। এ ধর্মের মূল দাবি ছিল হিন্দু, মুসলিম, খৃস্টান, পারসিয়ান ইত্যাদি সকল ধর্মের মূল শিক্ষা নিয়ে একটি ধর্ম প্রবর্তন করা। এ ধর্মের উপাস্যের প্রতীক ছিল সূর্য ও আগুন। এ ধর্মের প্রবর্তনের মাধ্যমে সালাত, সিয়াম, যাকাত ও ইসলামের সকল বিধান রহিত ও নিষিদ্ধ করা হয়, উপাস্যের প্রতীক সূর্য ও আগুনের পূজা চালু করা হয়। আর ‘আল্লাহর প্রতিনিধি’ ও ধর্মের প্রবর্তক বাদশাহকে সাজদা করার নিয়ম চালু করা হয়।

এ নতুন রাষ্ট্র ধর্মের মুল বৈশিষ্টাবলির মধ্যে ছিল:
(১) অগ্নি ও সূর্যের উপাসনা
(২) গঙ্গা নদীর পানিকে পবিত্র জ্ঞানে পান করা।
(৩) ছবি, মুর্তি, প্রতিকৃতি ইত্যাদির বৈধতা ঘোষণা।
(৪) সাজদায়ে তাহিয়্যাহ বা সালাম জ্ঞাপক সাজদাকে বৈধ বলে দাবি করে সম্রাটকে সাজদা করার আইন জারি করা।
(৫) ইসলামের ঈদ পরিত্যাগ করে নতুন নতুন বিভিন্ন পার্বন প্রচলন করা।
(৬) সালাত আদায় নিষিদ্ধ করা। রাজপ্রাসাদের মধ্যে প্রকাশ্যে কেউ সালাত আদায় করতে পারত না।
(৭) যাকাত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ফরমান জারি করা।
(৮) ইসলামের ঈমান, ইবাদত ও রীতিনীতি নিয়ে উপহাস করা।
(৯) ইসলামী আইন ও বিচারব্যস্থা বাতিল করে বিভিন্ন ধর্মের আইনের সংমিশ্রণে নতুন আইন চালু করা।

এ ধর্ম চালু করার প্রায় ১৫ বৎসর পরে ১৬০৫ খৃস্টাব্দে (১০১৪ হিজরীতে) আকবর মৃত্যুবরণ করেন। তার পর তার পুত্র নুরুদ্দীন জাহাঙ্গীর (রাজত্ব ১৬০৫-১৬২৭ খৃ/ ১০১৪-১০৩৬ হি) রাজ্যভার গ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীরও পিতার ধর্মমত অনুসারে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন।

স্বভাবতই রাষ্ট্রের ধার্মিক মুসলিমগণ এ অবস্থাতে বিক্ষুদ্ধ হন। এ সময়ে দীনের ঝান্ডা গ্রহণ করেন মুজাদ্দিদে আলফে সানী শাইখ আহমদ ইবনু আব্দুল আহাদ সিরহিন্দী (১৫৬৪-১৬২৪খৃ/৯৭১-১০৩৪ হি)। তাসাউফের সঠিক ব্যাখ্যা, পরিপূর্ণ শরীয়ত অনুসরণের মাধ্যমে পরিপূর্ণ তরীকত অর্জন, বিদআতে হাসানা ও বিদআতে সাইয়েআহ- অর্থাৎ ভাল বিদআত ও খারাপ বিদআতের পার্থক্য অস্বীকার করে ভাল ও খারাপ উভয় প্রকারের বিদআতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বিশুদ্ধ সুন্নাত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, দীন-ইইলাহীর প্রতিবাদ ও ইসলামের পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দাওয়াত দিতে শুরু করেন।

ক্রমান্বয়ে সমগ্র ভারতে তার দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর মধ্যেও তার দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারী আলিমগণ তাঁর বিরুদ্ধে ফাতওয়াবাজি শুরু করেন। সম্রাট তাঁকে গোয়ালিয়ার দুর্গে বন্দী

করেন। এক পর্যায়ে সেনাপতি ও অন্যান্য প্রভাবশালী তাকে বলেন যে, তারা সম্রাটকে হত্যা করে তাঁকে (শাইখ আহমদকে) ক্ষমতায় বসাবেন। কিন্তু তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি কারাগারের অভ্যন্তরেও তাঁর শান্তিপূর্ণ দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। পরে সম্রাট তাকে মুক্ত করেন এবং তাঁর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে দীন-ই-ইলাহী পরিত্যাগ করে ইসলামী আকীদা ও শরীয়ত গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। রাষ্ট্র প্রশাসন ছাড়াও সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে শাইখ আহমদের দাওয়াত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।[7]

ইসলামের ইতিহাসে এরূপ আরো অনেক সংস্কার কার্যক্রম আমরা দেখতে পাই। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই:
(১) কুফর, ইলহাদ ও অনাচারের বিরুদ্ধে দাওয়াতে সোচ্চার হওয়া।
(২) ধৈর্য ও বিনম্রতার সাথে দাওয়াতের কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া।
(৩) ফলাফলের চিন্তা না করে দায়িত্ব পালনের অনুভুতিতে কর্ম করা।
(৪) সকল প্রকার উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা বর্জন করা। বিরোধীদের অসহিষ্ণুতা, অত্যাচার ও উগ্রতা উত্তম আচরণ ও ধৈর্য দিয়ে মুকাবিলা করা।
(৫) রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বজায় রাখা। পাপ নয় এমন রাষ্ট্রীয় নির্দেশ মান্য করা। এমনকি গৃহবন্দী করলে বা কথা বলতে বাধানিষেধ আরোপ করলে তা মেনে নিয়ে প্রদত্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যেই দাওয়াত অব্যাহত রাখা।
(৬) শাসকদের পরিবর্তনের চেয়ে সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
(৭) অন্যায়কে অন্যায় বলার পাশাপাশি ভাল ও কল্যাণের কাজে শাসক বা প্রশাসকদের প্রশংসা করা, সহযোগিতা করা এবং তাদের থেকে যতটুকু সম্ভব দীনের স্বার্থ উদ্ধার ও রক্ষা করা।
ইসলামের ইতিহাসের এ সকল রাষ্ট্র-সংস্কার আন্দোলনের একটি লক্ষণীয় বিষয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলির নেতৃবৃন্দ নিজেরা ক্ষমতা গ্রহণ করতে চেষ্টা করেননি, উপরন্তু ক্ষমতা বা দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব বা সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা ক্ষমতাসীন বা দায়িত্বে রত 'সাধারণ' মুসলিম বা 'ফাসিক' মানুষদের মাধ্যমে যথাসম্ভব সংশোধন ও উন্নয়নের চেষ্টা করেছেন।
কোনো আলিম বা নেককার মানুষের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ ইসলামে নিষিদ্ধ বা আপত্তিকর নয়, বরং জরুরী ও কল্যাণকর হতে পারে। আফ্রিকার- বর্তমান নাইজেরিয়ার- প্রসিদ্ধ আলিম, পীর ও সফল সংস্কারক উসমান দান ফুদিও (Usuman dan Fodio: 1754-1817) -র সংস্কার আন্দোলন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কারকগণের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতির এ দিকটির কারণ ও প্রেক্ষাপট হিসেবে নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচ্য:

(১) তাঁরা অনুভব করতেন যে, ক্ষমতার সংশোধনের চেয়ে পরিবর্তন কঠিনতর। কোনো দেশেই ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতা ছাড়তে চান না। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও বিভিন্নভাবে ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতা আকড়ে ধরতে চান। আর তৎকালীন পরিবেশে হত্যাকান্ড বা যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া ক্ষমতার পরিবর্তন খুবই কঠিন ছিল। ক্ষমতার পরিবর্তন করতে রক্তারক্তির যে সম্ভাবনা সংস্কার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে এর সম্ভাবন ততটা নয়। এক্ষেত্রে আলিম বা সংস্কারক নির্যাতিত হলেও সাধারণ অনুসারী ও নাগরিকগণ নির্যাতন ও রক্তপাত থেকে রক্ষা পান। এজন্য তারা ক্ষমতার পরিবর্তন না করে সংস্কার চেষ্টাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ, উদ্দেশ্য তো যতটুকু সম্ভব পাপ অন্যায় দূর করা এবং দীনী দাওয়াতের পরিবেশ তৈরি করা।

(২) তারা ক্ষমতাসীনদেরকে বার্তা দিয়েছেন যে, আমরা আপনাদের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্ধী নই। আমরা আপনাদের কল্যাণকামী মাত্র। আপনাদের ক্ষমতার স্থায়িত্ব, দুনিয়ার সফলতা ও আখিরাতের মুক্তির জন্য আপনাদেরকে অমুক বা তমুক কাজগুলি করতে বা বর্জন করতে হবে। এ ‘‘বার্তা’’-সহ সংস্কার ও পরিবর্তনের দাওয়াত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের মনে প্রভাব ফেলে এবং পরিবর্তন সহজ হয়। পক্ষান্তরে কাউকে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্ধী মনে করলে ক্ষমতাসীনরা তার ভাল কথাও শুনতে রাজি হন না, বরং ক্ষমতার প্রতিদ্বন্ধী অতি আপনজনকেও আঘাত, হত্যা বা নিয়ন্ত্রণ করতে তৎপর হন।

(৩) ক্ষমতার পরিবর্তনে একজন বা একদল মানুষের পরিবর্তে অন্য মানুষ বা মানুষদের ক্ষমতায় বসাতে হয়। এক্ষেত্রে পরের মানুষগুলি ক্ষমতা গ্রহণের পরে পূর্ববর্তীদের চেয়ে অনেক ভাল বা পরিপূর্ণ ভাল হবেন বলে আশা করা কঠিন। কাজেই ক্ষমতা পরিবর্তন ছাড়াই যদি দাওয়তের উদ্দেশ্য আংশিক বা অনেকাংশে পূরণ হয় তাহলে তা মেনে নেওয়াই উত্তম।

(৪) আখিরাতমুখী আলিমগণ নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করতে ভয় পেতেন। দায়িত্ব গ্রহণ করে বৈষম্যহীন ন্যায়বিচার, সকল নাগরিকের অধিকার আদায়, সম্পদের সঠিক ব্যবহার ইত্যাদি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি হয়ে গোনাহের মধ্যে নিপতিত হবেন বলে তারা ভীত হতেন। তারা ভাবতেন যে, মূল উদ্দেশ্য কুফর, ইলহাদ ও অনাচার দূর করা এবং দীন ও দাওয়াতের নিরাপত্তা রক্ষা করা। তা যখন অন্যের মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে তখন নিজের আখিরাতকে ঝুঁকিপূর্ণ করার দরকার কী?

(৫) রাষ্ট্রের সাথে অগণিত মানুষের অধিকার ও স্বার্থ জড়িত। এখানে সাধারণত কেউই সকল নাগরিকের কাছে বা সকল ধার্মিকের কাছে ‘‘ভাল’’ বা ‘‘যোগ্য’’ বলে গণ্য হতে পারেন না। বরং সকলেই বিতর্কিত হন এবং অনেকেই ব্যর্থ বলে গণ্য হন। সাধারণ বা ‘‘ফাসিক’’ ব্যক্তি যদি রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হয় তাহলে ব্যর্থতার দায়ভার তার নিজের ঘাড়ে পড়ে। আর যদি আলিম, ইমাম বা সংস্কারক ব্যর্থ হন তাহলে তার দায়ভার দীনের উপরেই পড়ে। এতে দীনী দাওয়াত বিতর্কিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ফুটনোট

[1] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৯।

[2] যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা (শামিলা) ৩/৪১৪।

[3] আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ আল-হাম্বলী (১৩৯২ হি.); হাশিয়াতুর রাওদিল মুরবি’ শারহু যাদিল মুসতানকী ২/৩০৭।

[4] বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৬/৯০।

[5] সালিহ আল-শায়খ, শরহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিতিয়্যাহ ২/৩২১।

[6] ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইসলামী বিশ্বকোষ ১/৭০।

[7] আবুল হাসান নদবী, রিজালুল ফিকরি ওয়াদ দাওয়াত, ৩য় খণ্ড; গোলাম মোর্তাজা: ইতিহাসের ইতিহাস, পৃ. ১০২-১০৮; ইসলামী ফাউন্ডেশন, ইসলামী বিশ্বকোষ ১/৭০-৭১; ৩/২৩৬-২৩৮; ১৯/৫৮৬-৫৮৭; ৬৯১-৬৯৪।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6934

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন